॥ শ্রীহরি ॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দেজগদ্গুরুম্।।

|| শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিবেচন সারসংক্ষেপ ||

অধ্যায় 4: জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগ

3/3 (শ্লোক 29-42), শনিবার, 05 আগস্ট 2023

ব্যাখ্যাকার: গীতা বিশারদ মাননীয় শ্রীনিবাস বর্ণেকর মহাশয়

ইউটিউব লিঙ্ক: https://youtu.be/Ey0eln3WZ6Q

নিষ্কাম কর্মযোগই মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র পথ

জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পরম পূজনীয় শ্রী গোবিন্দদেব গিরিজী মহারাজ ও অন্যান্য সব গুরুজনদের প্রণাম এবং দীপ প্রজ্জ্বলনের পর আজ এই অর্থ বিবেচন সত্রের শুভারম্ভ হয়। ভগবানের মুখঃনিসৃত বাণীসমূহের সঙ্কলন এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । কর্মযোগ গীতার এক অতি সুন্দর ও মাহাত্ম্যপূর্ণ অধ্যায় । পূর্ববর্তী দুটি এবং এই সত্রে জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগ নামক অধ্যায়টির আলোচনা হচ্ছে যেটি কর্মযোগেরই বিস্তাররূপ । অধ্যায়ের প্রারম্ভেই ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন :

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম ।।৪.১।।

অর্থাৎ কর্মযোগের এই গূঢ়তত্ত্ব তিনি অর্জুনের আগে সূর্যদেবকে (বিবস্বান্ সূর্যদেবের আর এক নাম) বলেছিলেন এবং পরম্পরাক্রমে এই অবিনাশী জ্ঞান অনেকেরই প্রাপ্ত হয়েছিল।

কিন্তু কালের এমনই মহিমা যে আজ তা নষ্টপ্রায় হয়ে গেছে।

স কালেনেহ মহতা , যোগী নষ্টঃ পরন্তপ ।।৪.২।।

জ্ঞান কখনো নষ্ট হয় না, কিন্তু আমাদের জন্য মূল জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। তাই সমগ্র মানবজাতিকে এই যোগশাস্ত্রের জ্ঞান প্রদান করার জন্য কর্মযোগের মূলতত্ত্ব পুনরায় ভগবান অর্জুনকে বলেছেন। কর্মযোগের বিস্তারিত আলোচনা করার সময় ভগবান স্বয়ং নিজের প্রকট হওয়া এবং দিব্যকর্মের বিষয়েও উল্লেখ করেছেন। কর্মের মাঝে অকর্মকে এবং অকর্মের মাঝে কর্মকে কিভাবে দেখতে হবে সেই বিষয় নিয়েও পূর্ববর্তী সত্রে আলোচনা হয়েছে। মানুষের

স্বীয় কর্তব্য কর্মকে যজ্ঞরূপে কিভাবে রূপান্তরিত করা যায়, আমাদের জীবন কিভাবে যজ্ঞময় হয় সেই নিয়ে উপদেশ দেবার সময় ভগবান নানাবিধ যজ্ঞের উল্লেখ করেছেন :

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি, প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংয়মযোগাগ্নৌ, জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ।।৪.২৭।।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা, যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ, য়তয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।। ৪.২৮।।

এক শ্রেণীর যোগীগণ ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের সমস্ত ক্রিয়াকে যজ্ঞের আহুতিরূপে জ্বালিয়ে দেন। যোগীদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যজ্ঞ যেমন দ্রব্যময় যজ্ঞ, তপো যজ্ঞ এবং যোগো যজ্ঞ আদি অনুষ্ঠান করেন। কেউ কেউ আবার স্বাধ্যায়রূপী যজ্ঞও করেন। স্বয়ং গীতা অধ্যয়নও স্বাধ্যায় যজ্ঞ ।

জীবনে কিছু পাওয়ার জন্য কখনও কখনও কঠিন ব্রত ধারণ করার প্রয়োজন হয়। যোগশাস্ত্রের প্রারম্ভেই অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম দুটি অঙ্গ যথা যম ও নিয়মের কথা উল্লেখ আছে ।

অহিংসা সত্যমস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহানি যমাঃ|

“যম”-- নৈতিক শৃঙ্খলা । যোগশাস্ত্রে উল্লেখিত পাঁচ প্রকার যম : অহিংসা, সত্য, অস্তেয় , ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ ।

“নিয়ম”--- অভ্যাস । যোগশাস্ত্রে উল্লেখিত প্রধান নিয়মসমূহ : শৌচ , সন্তোষ , তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রাণিধান ।

যম, নিয়মাদি পালন করে আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টাও এক প্রকার যজ্ঞ। ভগবান বলেছেন যে এইপ্রকার যজ্ঞই শেষ নয়, আমাদের শ্বাস -প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াও হলো অখণ্ড যজ্ঞ। যজ্ঞের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রক্রিয়াকে দেখার কথা ভগবান পরবর্তী শ্লোকে বলেছেন :

4.29

অপানে জুহ্বতি প্রাণং(ম্), প্রাণেऽপানং(ন্) তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা, প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥29॥

“প্রাণায়াম” অষ্টাঙ্গযোগের চতুর্থ অঙ্গ। যম, নিয়ম, আসন এবং প্রাণায়ামকে বহিরঙ্গের সাধনা বলা হয়। বহিরঙ্গের সাধনার অন্তিম অঙ্গ হচ্ছে প্রাণায়াম। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সাধনা হয় তাকে বহিরঙ্গ সাধনা বলে। প্রাণায়ামের অভ্যাস কেন

করা হয় ? আমরা হয়তো জানি যে আসন ও প্রাণায়াম কেবল শারীরিক সুস্থতার জন্যই করা হয়। কিন্তু আসলে তা নয়। প্রাণায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে মহামুনি পতঞ্জলি বলেছেন:

"ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ।"

অর্থাৎ প্রাণায়াম জ্ঞানের উপর অজ্ঞানরূপী আবরণকে ছিন্ন করে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া একটি অখণ্ড যজ্ঞ। এর কোনো বিরাম নেই। ভগবান বলেছেন :

অপানে জুহ্বতি প্রাণং(ম্), প্রাণেऽপানং(ন্) তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা, প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥

অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে ও প্রাণবায়ুকে অপানবায়ুতে আহুতি এবং প্রাণ-অপান বায়ুর গতিকে রোধ করে রাখার প্রক্রিয়াই প্রাণায়াম ।

প্রাণায়াম করার সময় শ্বাস নেবার প্রক্রিয়াকে বলা হয় "**পূরক**"; শ্বাস ছাড়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় "**রেচক**" এবং নিজের সাধ্য অনুযায়ী শ্বাসের গতি রোধ করে রাখাকে বলা হয় **"কুম্ভক"**।

আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া প্রতিনিয়ত চলছে। কিভাবে এই প্রক্রিয়া চলছে, কে করছে, সেই বিষয়ে আমরা হয়তো ভাবি না। যোগশাস্ত্র মতে বায়ুর এই গতিবিধির বিষয়ে জানতে হলে বায়ুত্বত্ত্বের সাথে মনের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। পরমাত্মার ন্যায় বায়ুত্বত্ত্ব সর্বত্র বিরাজমান। পরমাত্মার সাথে একাত্মা হবার প্রচেষ্টার প্রারম্ভে বায়ুত্বত্ত্বের সাথে মনের সংযোগ স্থাপন অর্থাৎ প্রাণায়াম অভ্যাস করা অত্যন্ত্য আবশ্যক। প্রাণায়াম অভ্যাস করার সময় ইড়া , পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ির মাধ্যমে প্রবাহিত বায়ুর প্রতি মনোনিবেশ করলে নিজের অজান্তেই চিত্তে একাগ্রতা বাড়ে। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেশ্বর মহারাজ প্রাণায়ামের এক সুন্দর নাম দিয়েছেন– "মন পবনাচী খেলণী", অর্থাৎ "মন ও বায়ুর খেলনা" যা ভগবান আমাদের হাতে দিয়েছেন। এই খেলনার সাথে খেলতে খেলতে আমাদের মন বায়ুত্বত্ত্বের সাথে একাকার হয়ে যায়, বাহ্যিক বিষয়বস্তুর প্রতি মন নিরাসক্ত হয়ে পরমাত্মার সাথে একাত্মা হয়ে যাবার মার্গে চলতে শুরু করে।

প্রাণায়াম অভ্যাস করার সময় মাহাত্ম্যপূর্ণ ইন্দ্রিয় হচ্ছে **মন**। এই মনকে বায়ুত্বত্ত্বের সাথে একাকার করার প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে যজ্ঞে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

4.30

অপরে নিয়তাহারাঃ(ফ্),প্রাণান্প্রাণেষু জুহ্বতি।।
সর্বেऽপ্যেতে য়জ্ঞবিদো, য়জ্ঞক্ষপিতকল্মষা: ॥30॥

আবার অন্যান্য যোগিগণ অপানবায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি দেন, সেইরূপ কেউ আবার প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুর আহুতি দেন। আবার কোনো নিয়মিত আহারী(১) প্রাণায়ামপরায়ণ পুরুষ প্রাণ ও অপানের গতিরুদ্ধ করে প্রাণকে প্রাণে আহুতি দেন। এই সকল সাধকই হলেন যজ্ঞের দ্বারা পাপসমূহের বিনাশকারী এবং যজ্ঞসমূহের জ্ঞাতা। ২৯-৩০

জীবনে কিছু প্রাপ্ত করার জন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রণাধীন করা অত্যন্ত আবশ্যক। ভগবান আহারের উপর নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। আমরা মুখ ও জিহ্বার সাহায্যে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করাকেই আহার বলে জানি। কিন্তু তা নয়। পঞ্চয়েন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা হয়, সবই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আহার।

- চোখের আহার হল দৃশ্য। চোখ দিয়ে যা দেখি সেটা আমরা গ্রহণ করি।

- কানের আহার হল শব্দ। যে শব্দ আমাদের কানে আসে, সেটা আমরা গ্রহণ করি।

- নাকের আহার হচ্ছে গন্ধ। যে গন্ধ বাতাসে ভেসে আমাদের নাকে পৌঁছায়, আমরা সেটা গ্রহণ করি।

- ত্বকের (চামড়া) আহার স্পর্শ। স্পর্শের অনুভূতি আমরা গ্রহণ করি।

- জিহ্বার আহার হচ্ছে স্বাদ। জিহ্বা দিয়েই আমরা খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ বুঝতে পারি।

এই সর্বপ্রকার আহার কিভাবে এবং কতটুকু নেওয়া উচিত সেটার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা খুবই আবশ্যক। অনিয়ন্ত্রিত আহার গ্রহণ করা ব্যক্তি কখনও যোগ প্রাপ্ত করতে পারে না।

যুক্তাহারবিহারস্য, যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য, যোগো ভবতি দুঃখহা।।৬-১৭।।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে পরিমিত আহার ও বিহার এবং যোগাভ্যাসের দ্বারা জড়-জাগতিক দুঃখ নাশ করা সম্ভব।

আহার ও বিহারে নিয়ন্ত্রণ রেখে কেউ কেউ প্রাণবায়ুকে প্রাণবায়ুতেই আহুতি দেন। এটিও প্রকার যজ্ঞ। ভগবান বলেছেন যে এই সমস্ত যজ্ঞতত্ত্ববিদ যোগীদের চিত্ত যজ্ঞের প্রভাবে নির্মল হয়ে পাপ মুক্ত হয়।

শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেশ্বর মহারাজ অন্যভাবে যজ্ঞের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য কৃত সমস্ত কর্তব্য কর্মই যজ্ঞ। নিত্য কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করলে ধীরে ধীরে চিত্তে শুদ্ধতা আসে এবং জ্ঞান লাভের পথ সুগম হয়।

4.31

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো, য়ান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং(ম্) লোকোऽস্ত্যয়জ্ঞস্য, কুতোऽন্য:(খ্) কুরুসত্তম ॥31॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! যজ্ঞাবশেষ অমৃত অনুভবকারী যোগিগণ সনাতন পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন। আর যাঁরা যজ্ঞ করেন না তাঁদের ইহলোকও সুখদায়ক হয় না, পরলোক তো দূরের কথা ! ৩১

নানাবিধ যজ্ঞের বিষয়ে অর্জুনকে এবং পরোক্ষভাবে জগতের সবাইকে অবগত করানোর পর ভগবান বলেছেন যে যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠান করার পর, যজ্ঞাবশিষ্ট হচ্ছে পরমব্রহ্মের প্রসাদ যা অমৃতসম। এই অমৃতসম প্রসাদ যিনি গ্রহণ করেন তাঁর পরমব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। ভগবান এখানে প্রিয় শিষ্য ও সখা অর্জুনকে কুরুশ্রেষ্ঠ নামে সম্বোধন করে বলেছেন, " হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান না করে কেউ পরলোকে এমনকি ইহলোকেও সুখ প্রাপ্ত করতে পারে না"।

4.32

এবং(ম্) বহুবিধা য়জ্ঞা, বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্বিদ্ধি তান্সর্বান্, এবং(ঞ্) জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥32॥

এইরূপ আরও বহুপ্রকার যজ্ঞের কথা বেদে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এ সবই মন, ইন্দ্রিয়াদি ও কায়িক ক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয় বলে জানবে, এইরূপ তত্ত্বতঃ জেনে এগুলির অনুষ্ঠান করলে তুমি কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হবে। ৩২

এই সমস্ত নানাবিধ যজ্ঞ বৈদিক শাস্ত্রে অর্থাৎ বেদে উল্লিখিত। ভগবান বলেছেন সর্বপ্রকার যজ্ঞ বিভিন্ন প্রকার কর্ম হতেই উৎপন্ন। নিজের সুখের বাসনা বিসর্জন দিয়ে দেশের জন্য, দশের জন্য , স্ব স্ব ধর্ম পালন করার জন্য কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করে পরমাত্মার উদেশ্যে অর্পণ করলে, কর্মসমূহ যজ্ঞময় হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাবরকর একটি কবিতায় লিখেছিলেন ," হে মোর মাতৃভূমি, আমার দেহ, মন, কর্ম, কবিতা , লেখনী ও সমস্ত কিছু তোমাকেই অর্পণ করেছি। আমার সব কিছুই তুমি, তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছুই জানিনা।" কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে ভগবানকে অর্পণ করলে কর্মবন্ধন হতে মুক্তিলাভ করা যায়, যা পরমাত্মার সাথে একাত্মা হবার পথ সুগম করে। লোহাকে কাটবার জন্য যেমন লোহার করাত দরকার হয়, ঠিক তেমনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য কর্ম করা আবশ্যক। প্রতিটি কর্ম সম্পন্ন করার পর ভগবানের চরণে অর্পণ করলে ধীরে ধীরে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব। ভগবান তাই অর্জুনকে কর্তব্য কর্ম যজ্ঞময় করে সম্পন্ন করার উপদেশ দিয়েছেন । শ্রদ্ধেয় গোবিন্দদেব গিরিজী মহারাজ বলেছেন, "গীতা পড়ুন, পড়ান ও জীবনে আনুন।" নিজের জীবনে আনার অর্থ এই যে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কর্ম যজ্ঞরূপে সম্পন্ন করে যজ্ঞরূপী পরমব্রহ্মের চরণে অর্পণ করলে কর্মবন্ধনে মানুষ আবদ্ধ হয় না। জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে তার মুক্তিলাভ হয়।

4.33

শ্রেয়ান্দ্রব্যময়দ্যজ্ঞাজ্, জ্ঞানয়জ্ঞঃ(ফ্) পরন্তপ।
সর্বং(ঙ্) কর্মাখিলং(ম্)পার্থ , জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥33॥

হে পরন্তপ অর্জুন ! দ্রব্যময় যজ্ঞ হতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ সমস্ত কর্ম জ্ঞানেই সমাপ্ত হয়। ৩৩

ভগবান অর্জুনকে পরন্তপ অর্থাৎ শত্রুদমনকারী নামে সম্বোধন করে বলেছেন যে দ্রব্যময় যজ্ঞের তুলনায় জ্ঞানময় যজ্ঞ অধিক হিতকারী ও শ্রেষ্ঠ। সমস্ত কর্মই পরিশেষে জ্ঞানে সমাপ্ত হয়।
তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভগবানকে প্রশ্ন করেছিলেন:

জ্যায়সী চেৎকর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎকিং কর্মণি ঘোরে মাং, নিয়োজয়সি কেশব ।।৩.১।।

জ্ঞান অথবা বুদ্ধি যদি কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে ভগবান কেন বারবার অর্জুনকে কর্তব্য কর্ম অর্থাৎ যুদ্ধ করার উপদেশ দিচ্ছেন ?

কোনো কিছুর বিষয়ে জানাকে সাধারণত জ্ঞান বলা হয়। কিন্তু ভগবান এখানে কোন জ্ঞানের কথা বোঝাতে চাইছেন ? পরম পূজ্য রামদাস স্বামী জ্ঞানের অর্থ অতি সরল ভাষায় বলেছেন:

পাহণে আপনাসী আপন হে জ্ঞান।

স্বয়ংকে জানতে পারাই হলো প্রকৃত জ্ঞান। সেটিই আত্মজ্ঞান, সেটিই আধ্যাত্মিক জ্ঞান । ভগবানও সেটাই স্পষ্ট করেছেন যে স্বয়ংকে অর্থাৎ আত্মাকে জানাই হল প্রকৃত জ্ঞান। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ ও দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা কিছু জ্ঞান অর্জন করি সেই সবই সংসার, সমাজ ও জীবিকা নির্বাহের জন্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন :

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
ত্রতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তম্ , অজ্ঞানং যদতোऽন্যথা ।।১৩.১১।।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানে আত্মার স্বরূপকে জেনে এটা উপলব্ধি করা যে আমার এই শরীর আমি নই, পরমাত্মার অংশরূপে যে আত্মা আমার মাঝে বিরাজমান, সেই আত্মাই আমি। ভগবান বলেছেন এই আত্মত্বত্ত্বই প্রকৃত জ্ঞান আর বাকী সব জ্ঞানই অজ্ঞান। এই ত্বত্ত্বকে জানবার প্রয়াসই জ্ঞানযজ্ঞ।

গীতা পরিবার দ্বারা আয়োজিত গীতা-অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেকে জানার যে প্রয়াস আমরা করছি সেটিও জ্ঞানযজ্ঞ। এই

প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হলে মানুষের কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হয়। মানুষ কর্মবন্ধনে তখনই আবদ্ধ হয় যখন সে কাজটিকে নিজের কাজ হিসেবে ভাবতে শুরু করে। কিন্তু যদি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবা যায় যে পরমাত্মার কৃপায় এই কাজ করার সুযোগ পাওয়া গেছে তাহলে মানুষ সেই কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। আত্মতত্ত্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হলে সমস্ত কর্ম এই জ্ঞানেই সমাপ্ত হয়।

শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলেছেন, "যে জ্ঞান প্রাপ্ত হলে "আমি-আমার" ভাব সমাপ্ত হয়ে যায়, শাস্ত্র সম্পর্কিত তর্কের প্রয়োজন হয় না, ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়াদির কথা ভুলে যায়, মনের চঞ্চলতা দূরীভূত হয় এবং পরমব্রহ্ম প্রাপ্তির অনুভূতি হয়, সেটিই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান।"

এই প্রকৃত জ্ঞানলাভের সহজ রাস্তা ভগবান পরবর্তী শ্লোকে বলেছেন।

4.34

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং (ঞ্), জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥34॥

সেই জ্ঞান তুমি তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে জেনে নাও ; তাঁদের বিনয়পূর্বক প্রণাম ও সেবা তথা কপটতা ত্যাগ করে সরলভাবে প্রশ্ন করলে সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন। ৩৪

পরম জ্ঞানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবগত করানোর পর ভগবান অর্জুনকে এবং পরোক্ষভাবে মানবসমাজকে সদগুরুর শরণাপন্ন হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন কারণ তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ এই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং তাঁর সান্নিধ্যে এলেই এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর রথের সারথী ও সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অবসাদগ্রস্থ চিত্তে বলেছিলেন যে রাজ্যলাভের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও গুরুজনদের হত্যা করে পাপের ভাগী হতে চান না। সেইসময় ভগবান নির্বাক শ্রোতা ছিলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুন যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে জ্ঞানভিক্ষা চাইলেন, তখন তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পরম জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। এখানে লক্ষণীয় এই যে অর্জুন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে জ্ঞান ভিক্ষা না করা অবধি ভগবান নির্বাক শ্রোতা ছিলেন। অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন যে ভগবান সদগুরু ও তত্ত্বদ্রষ্টা। তাই সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং তখন ভগবান অর্জুনকে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন ।

"প্রণিপাতেন"-- সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হওয়া, দণ্ডবৎপ্রণাম। দণ্ড শব্দের অর্থ হল লাঠি। একটি লাঠিকে মাটিতে শুইয়ে রাখার ভঙ্গিমায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নিজের সমস্ত মনপ্রাণ তত্ত্বদ্রষ্টা গুরুর শ্রীচরণে অর্পণ। এইভাবে গুরুর শরণাগত হয়ে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করার উপদেশ ভগবান দিয়েছেন। মানুষ নিজের জীবনে যতই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, সদগুরুর শরণাপন্ন না হয়ে এই জ্ঞান অর্জন করা কঠিন।

তত্ত্বদ্রষ্টা শব্দটি অতি মাহাত্ম্যপূর্ণ। তত্ত্ব — তৎ শব্দের অর্থ হল "উনি"। উনি কে? **সপ্তদশ অধ্যায়ে আমরা পরম ব্রহ্মের তিনটি নাম জেনেছি ; ওঁ ,তৎ এবং সৎ। তৎ** অর্থাৎ পরমব্রহ্ম। **ত্ব** হচ্ছে ভাব। পরমব্রহ্মের ভাবই তত্ত্ব। মাতৃত্ব যেমন মা না হলে জানা যায় না, বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত না হলে বৃদ্ধত্ব যেমন উপলব্ধি করা যায় না; বালকের শিশুসুলভ ভাব জানার জন্য যেমন বালকের সাথে একাত্মা হওয়া প্রয়োজন ঠিক তেমনি পরমাত্মার সাথে একাত্মা হয়ে যাওয়া জ্ঞানী ব্যক্তিই পরম তত্ত্বের অধিকারী। গৌতম বুদ্ধ, ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আদি অবতারগণ ছিলেন তত্ত্বদর্শী। তত্ত্বদর্শী সদগুরুর অনুসন্ধান করা হলো যোগ্য শিষ্যের কর্তব্য। গুরুকে স্বীকার করার আগে সর্বপ্রকারে যাচাই করা অন্যায় নয়। কিন্তু যখন এই বিশ্বাস হবে যে তিনি একজন তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ, তখন সম্পূর্ণরূপে সেই সৎগুরুর শরণাগত হতে হয়। শুধু তাই নয়, গুরুকে অকৃত্রিম সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করা শিষ্যের কর্তব্য। শিষ্যের বিনম্রতা ও আজ্ঞানুবর্তী সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে সদগুরু পরম তত্ত্বজ্ঞান শিষ্যকে প্রদান করেন। যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গুরু হিসেবে মান্যতা দেবার পূর্বে কতবার উনার পরীক্ষা নিয়েছেন সেই বিষয়ে আমরা সবাই অবগত। তত্ত্বপিপাসু শিষ্যের বিনম্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নের সমাধান গুরু করেন। গুরু-শিষ্যের এই পরম্পরা আদি অনন্তকাল হতে আমাদের দেশে চলে এসেছে।

4.35

য়জ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহম্,এবং(ম্) য়াস্যসি পান্ডব।
য়েন ভূতান্যশেষেণ,দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥35॥

যা জানলে তুমি আর এইরূপ মোহগ্রস্ত হবে না এবং হে অর্জুন ! যে জ্ঞানের দ্বারা তুমি সমস্ত ভূতাদি নিরবশেষ প্রথমে নিজের মধ্যে এবং পরে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মারূপী আমাতে দেখতে সক্ষম হবে। ৩৫

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন প্রথমে বিষাদগ্রস্থ হয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অসম্মত হয়েছিলেন কারণ তিনি মোহজালে আবদ্ধ ছিলেন। তাই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে এই পরমতত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্ত হবার পর তিনি আর মোহগ্রস্থ হবেন না। যিনি এই পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন তিনি জানতে পারেন যে সকল জীব পরমাত্মারই অংশ। মনে দ্বৈতভাব থাকে না। নিজের মধ্যেই সমস্ত জীবকে দর্শন করেন এবং ধীরে ধীরে উপলব্ধি হয় যে সমস্ত জীব ও ভগবান অভিন্ন। সর্বভূতে পরমব্রহ্মের দর্শন হয়। অজ্ঞানতা হৃদয়কে আর কলুষিত করতে পারে না। পরের সুখে আনন্দ উপভোগ করেন, অন্যের দুঃখকে নিজের ভেবে কষ্ট পান। তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের হৃদয় মাখনের থেকেও নরম হয় এবং অন্যের দুঃখ দেখেই তা গলে যায়। এই জ্ঞানের ফলে মনের দ্বৈতভাব লোপ পায়। সমস্ত জগৎ, স্বয়ং নিজে এবং পরমাত্মা সব একাত্মা হয়ে যায়।

4.36

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ(স্), সর্বেভ্যঃ(ফ্) পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং(ঞ্)জ্ঞানপ্লবেনৈব ,বৃজিনং(ম্) সন্তরিষ্যসি ॥36॥

যদি তুমি সমস্ত পাপীর থেকেও অধিক পাপী হও তা হলেও তুমি জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যে নিঃসন্দেহে সমগ্র পাপসাগর উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। ৩৬

\এই জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য কি কি গুণের প্রয়োজন সেই প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। অর্জুন কিংকর্তবিমূঢ় হয়ে ভাবছিলেন যে যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করলে তিনি পাপের ভাগী হবেন। সবাই অর্জুনকে পাপী বলে জানবে এবং ফলস্বরূপ তার নরকবাস হবে। অর্জুনের এই শঙ্কা দূর করার জন্য ভগবান বলেছেন, " হে অর্জুন, তুমি যদি পাপীদের থেকেও অধিক পাপী হিসাবে গণ্য হয়ে থাক, তথাপি এই জ্ঞানরূপী নৌকায় আরোহণ করে বিশাল পাপসাগর পার হতে পারবে।" এই জড় -জগৎকে কখনো পাপসাগর আবার কখনো অবিদ্যার সাগরের সাথে তুলনা করা হয়। অতি সুদক্ষ সাঁতারুর জন্যও সমুদ্র অতিক্রম করা অনেক কষ্টকর। সমুদ্রের মাঝখানে সংগ্রামরত মানুষকে যদি কেউ উঠতে সাহায্য করে, তাহলে সে রক্ষাকর্তা। ঠিক তেমনি সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন, পরমাত্মার সাথে একাত্মা হওয়ার তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র পথ। সেটিই জ্ঞানরূপী নৌকা।

ভক্তবৃন্দের সাথে তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটি অতিসুন্দর গল্প বলেছিলেন:

প্রভু শ্রীরামচন্দ্র মহাবীর হনুমানজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন," হনুমান, তুমি আমায় কিভাবে দেখ ?" হনুমান উত্তর দিয়েছিলেন," হে প্রভু, যখন "আমি" বলে আমার বোধ থাকে, তখন দেখি, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি প্রভু, আমি দাস। কিন্তু হে রাম ! যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।"

4.37

যথৈধাংসি সমিদ্ধোऽগ্নিঃ(র্), ভস্মসাৎকুরুতেsর্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ(স্) সর্বকর্মাণি ,ভস্মসাৎকুরুতে তথা ॥37॥

কারণ হে অর্জুন ! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন ইন্ধনকে ভস্মীভূত করে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও তেমনই সমস্ত কর্মকে ভস্মীভূত করে। ৩৭

ভগবান বলেছেন যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন সমস্ত দাহ্য কাষ্ঠকে ভষ্মস্যাৎ করে, ঠিক তেমনি প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত কর্মকে দগ্ধ করে ফেলে। পরম তত্ত্বজ্ঞানকে অগ্নির সাথে তুলনা করা হয়েছে। এখানে কর্ম কেবল পাপকর্মকে বোঝায় না। সর্বপ্রকার কর্ম এমনকী পূর্বজন্মকৃত কর্মও জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। সমস্ত কর্ম জ্ঞানাগ্নিতে সমাপ্ত হয়ে যায় এবং মানুষ কর্মবন্ধন হতে মুক্তি লাভ করে। মনে প্রশ্ন জগতে পারে যে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর শরণাগত না হলে কি এই পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একটি সুন্দর উপমা দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন :

দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিনীর মন্দিরের লাগোয়া গঙ্গার ঘাটে একদিন সকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তদের সাথে বসেছিলেন। এক ভক্ত প্রশ্ন করেছিল, " ঠাকুর, গুরুর শরণাগত না হলে কি ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না ?" ঠাকুর কোন উত্তর দিলেন না । কিছুক্ষণ পর একটি যাত্রীবাহী স্টিমার গঙ্গার উপর দিয়ে যাচ্ছিল। ঠাকুরকে দেখে নাবিক দূর থেকে নমস্কার করলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন,"কোথায় যাচ্ছ ?" জবাব এল ,"চাঁদপাল ঘাট"। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন,"কত সময় লাগবে?" নাবিক জবাব দিল, "দু ঘন্টা লাগবে ঠাকুর।" স্টিমারটি ধীরে ধীরে চোখের আড়াল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর একটি নৌকা কিছু যাত্রী নিয়ে গঙ্গার ঘাট দিয়ে যাচ্ছিল। ঠাকুর মাঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, " কি গো মাঝি , কতদূর যাবে?" দূর থেকে ঠাকুরকে নমস্কার করে মাঝি বলল , "চাঁদপাল ঘাট ঠাকুর।" ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করলেন ," কখন পৌঁছাবে মাঝি?" জবাব এল,"সন্ধ্যা হয়ে যাবে।" নৌকাটি ধীরে ধীরে চলে গেল। ঠাকুর তখন সেই ভক্তকে বললেন," স্টিমার ও নৌকা দুটোই চাঁদপাল ঘাট যাচ্ছে। স্টিমারটি দু ঘন্টায় পৌঁছে যাবে কিন্তু নৌকাটি পৌঁছাবে সেই সন্ধ্যায়। নৌকাটিকে যদি স্টিমারের সাথে বেঁধে দেয়, তাহলে নৌকাটি অনেক তাড়াতাড়ি চাঁদপাল ঘাটে পৌঁছে যাবে। গুরুর শরণাগত হলে তিনি শিষ্যকে জ্ঞানমার্গ দেখিয়ে দেন এবং সেই পথে এগিয়ে গেলে সহজেই ঈশ্বরকে জানা যায় এবং সেটিই হল পরম জ্ঞান।"

4.38

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং(ম্) ,পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং(ম্) যোগসংসিদ্ধঃ(খ্) কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥38॥

নিঃসন্দেহে এই জগতে জ্ঞানের মতো পবিত্রকারী আর কিছুই নেই। দীর্ঘকাল প্রযত্ন দ্বারা কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ সাধক স্বয়ংই নিজের মধ্যে সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। ৩৮

এই জগতে প্রকৃত জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নেই। ঈশ্বরকে জানাই প্রকৃত জ্ঞান, আর বাকী সব অজ্ঞান। ভগবান বলেছেন এই জ্ঞান আমাদের অন্তরেই উপলব্ধ। অজ্ঞানের আবরণের জন্য এই জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। বৈদ্যুতিক আলোর পূর্বে লণ্ঠনের প্রচলন ছিল। কাঁচের আবরণে আগুন ঢাকা থাকতো। লণ্ঠন জ্বালালে আলোর প্রকাশ হতো। আগুনের শিখার থেকে কাঁচের আবরণটি ধীরে ধীরে কালো হয়ে যেত এবং আলোর প্রকাশ ঠিকভাবে হতো না। কাঁচের আবরণটি পরিষ্কার করে দিলেই আবার আলোর প্রকাশ হতো। নিষ্কাম কর্ম ও যোগাভ্যাসের দ্বারা আমাদের অন্তরের কালিমা দূর হয়ে যায় এবং জ্ঞানের প্রকাশ হয়। জলপূর্ণ পাত্রে নিজের প্রতিবিম্ব দেখার জন্য নির্মল ও শান্ত জলের প্রয়োজন। জল যদি নোংরা এবং অশান্ত হয় তাহলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা সম্ভব হয় না। নিজের স্বরূপ তখনই প্রকাশিত হয় যখন অন্তরাত্মা নির্মল, শান্ত ও স্থির হয়। ভগবান আগে বলেছেন যে কিভাবে যোগাভ্যাস, প্রাণায়াম আদি ক্রিয়া আমাদের অন্ধকারের গ্লানিমা ঘুচিয়ে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটায়। দীর্ঘকাল নিয়মিত যোগাভ্যাস ও নিষ্কাম কর্মযোগের মাধ্যমে আমাদের মন স্থির হয়, অন্তর নির্মল হয় এবং তখন নিজের স্বরূপকে জানতে পারি।

দুজন শিষ্য এক গুরুর নিকট জ্ঞান অধ্যয়ন করছিল। একজন শিষ্য গুরুর চরণ স্পর্শ করে জিজ্ঞাসা করল যে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করতে কত সময় লাগবে। গুরু সামনে একটি গাছ দেখিয়ে বললেন যে সেই গাছে যত পাতা আছে, অভ্যাস করলে তত জন্মে নিশ্চয়ই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হবে। শিষ্য নিরাশ হয়ে গুরুগৃহ ত্যাগ করে চলে গেল। অন্যজন

জিজ্ঞাসা করল যে সত্যি কি তত জন্মের অভ্যাসে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হবে। গুরুর আশ্বাস পেয়ে শিষ্য একাগ্র চিত্তে অভ্যাস করা আরম্ভ করলো এবং আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করতে সক্ষম হল। নিত্য কর্মযোগের অভ্যাসে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হবে এটা সুনিশ্চিত। এই জ্ঞান চৈতন্যস্বরূপ। যিনি এই জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি অন্তরের অন্তস্তলে নিত্য শান্তি উপভোগ করেন।

4.39

শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং(ন্), তৎপরঃ(স্) সংয়তেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং(ম্) লব্ধ্বা পরাং(ম)শান্তিম্ , অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥39॥

জিতেন্দ্রিয়, সাধনপরায়ণ, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ পরমশান্তি লাভ করেন। ৩৯

পরমজ্ঞান লাভের জন্য কি কোন যোগ্যতার প্রয়োজন আছে ? ভগবান বলেছেন, কেবল শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন। শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছাড়া ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করা যায় না। তিনিই শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি, যিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরকে জানাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান, বাকি সব অজ্ঞান। জ্ঞানই হোক আর বিজ্ঞানই হোক, মনে বিশ্বাস না থাকলে কিছুই লাভ করা যায় না। বিশ্বাসের ব্যাখ্যা আচার্য বিনোভা ভাবে সুন্দরভাবে একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। গণিত শাস্ত্র পড়াবার সময় শিক্ষক বলেন যে "বিন্দু" একটি সাংকেতিক চিহ্ন যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা নেই। ছাত্র এই কথা মানতে নারাজ হলো কারণ এমন কিছুই নেই যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ কিম্বা উচ্চতা নেই। শিক্ষক ছাত্রকে এটি কল্পনা করতে বললেন। ছাত্রটি বললো যা নেই সেটা কল্পনা করা অসম্ভব। তখন শিক্ষক বললেন যে এই অবিশ্বাস তোমার জ্যামিতি শেখার পথে বাধা সৃষ্টি করবে।

আত্মতত্ত্ব জানতে হলে মনে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি থাকতে হবে। ভগবান বলেছেন যে ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে ও তৎপর হয়ে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি কর্মযোগের আচরণ করে এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করে অচিরেই পরম শান্তি অনুভব করেন। তাকে শান্তির জন্য অন্যত্র অন্বেষণ করতে হয় না। নিজের অন্তরেই শান্তি উপভোগ করেন।

4.40

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ , সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং(ম্) লোকোऽস্তি ন পরো ,ন সুখং(ম্) সংশয়াত্মনঃ ॥40॥

বিবেকরহিত ও শ্রদ্ধাহীন সংশয়াকুল ব্যক্তি পারমার্থিক পথ হতে অবশ্যই ভ্রষ্ট হয়। এইরূপ সংশয়াত্মার ইহলোকও নেই, পরলোকও নেই এবং সুখও নেই। ৪০

এক শ্রেণীর লোক আছে যারা অজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ত্র সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই। অন্য এক শ্রেণী আছে যার শাস্ত্রজ্ঞান থাকলেও শাস্ত্রের উপদেশ না মেনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে নানা ধরণের যুক্তি-তর্কে ডুবে থাকে; কিন্তু শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস নেই। পরমাত্মার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। ভগবান বলেছেন অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কখনও ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় না। ডাক্তারের এবং ঔষধের প্রতি সংশয় থাকা রোগীর যেমন রোগ নিরাময় হয় না, ঠিক তেমনই সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি ভক্তিমার্গ, জ্ঞানমার্গ কিম্বা কর্মমার্গে থাকলেও আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না এবং পথভ্রষ্ট হয়। ভগবান বলেছেন শ্রদ্ধাহীন ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি ইহলোকে এমনকি পরলোকেও কোনো সুখ ভোগ করতে পারে না। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পরম জ্ঞান লাভের পথ প্রশস্ত করে।

4.41

যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং(ঞ্),জ্ঞানসঞ্ছিন্নসংশয়ম্ ।
আত্মবন্ত (ন্) ন কর্মাণি, নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥41॥

হে ধনঞ্জয় ! যিনি কর্মযোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম পরমাত্মায় অর্পণ করেছেন এবং বিবেকের দ্বারা সমস্ত সংশয় নাশ করেছেন এইরকম বশীভূত-চিত্ত ব্যক্তিকে কর্ম কখনও বদ্ধ করতে পারে না। ৪১

ভগবান অর্জুনকে এখানে ধনঞ্জয় নাম সম্বোধন করেছেন। ভগবান বলেছেন, যে ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করে কর্মত্যাগ করেন অর্থাৎ ভগবানের শ্রীচরণে সমস্ত কর্ম অর্পণ করেন, তত্ত্বজ্ঞান লাভের দ্বারা সংশয় নাশ করেন এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করে আত্মার স্বরূপ অবগত হন, তাকে কোন কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না।

এখানে তাৎপর্য্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে ভগবান আমাদের কর্মযোগের দ্বারা কর্ম সম্পন্ন করার পর সেই কর্মকে ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছেন। কর্ম সম্পন্ন না করে ত্যাগ করার কথা বলেননি। মানুষ সেই জিনিষ ত্যাগ করতে পারে যেটি ওর নিজের। কেউ যদি কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন না করে, তাহলে ত্যাগ করার প্রশ্নই আসে না। পরমাত্মাকে জানাই প্রকৃত জ্ঞান, বাকি সব অজ্ঞান। ভগবান বলেছেন প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হলে সংশয় নিজে নিজে দূর হয়ে যায়। পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ এই জীবাত্মার স্বরূপ অবগত হলে নিজেকে আর কর্মের কর্তারূপে মনে হয় না। আমি অকর্তা, এই বোধ জন্মালেই কর্মফলের আসক্তি নাশ হয় এবং কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। এই অধ্যায়ের নাম জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগ অর্থাৎ জ্ঞান আহরণ করা এবং তদ্‌পশ্চাৎ কর্মযোগের দ্বারা কৃতকর্ম ত্যাগ করে দেওয়া।

4.42

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং(ম্), হৃৎস্থং(ঞ্) জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং(ম্) সংশয়ং(ম্)যোগম্ , আতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥42॥

অতএব হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! তুমি হৃদয়স্থিত এই অজ্ঞানজাত সংশয়কে বিবেকজ্ঞানরূপ তরবারির সাহায্যে ছেদন করে সমত্বরূপ যোগে স্থিত হও এবং যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও। ৪২

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের হৃদয়ে অজ্ঞানপ্রসূত এই সংশয় উদিত হয়েছিল যে শত্রুপক্ষের সবাই তাঁর আত্মীয়-পরিজন, যাদের হত্যা করলে তিনি পাপের ভাগী হবেন। ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে অর্জুন সঠিক মার্গদর্শনের প্রার্থনা জানালে ভগবান অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মযোগ, আত্মতত্ত্বজ্ঞান, নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয়ে অবগত করিয়েছেন। অর্জুন একজন ক্ষত্রিয়। ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয় ধর্ম। এই কথা স্মরণ করিয়ে ভগবান অর্জুনকে জ্ঞানরূপী তলোয়ারের দ্বারা অজ্ঞানপ্রসূত সংশয় ছিন্ন করার উপদেশ দিয়েছেন এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম পালনের অর্থাৎ যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

ভগবানের এই উপদেশ আমাদের সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মোহগ্রস্থ হয়ে আমরা অনেক সময় কর্তব্যকর্ম থেকে পিছুপা হয়ে যাই। কর্ম করার পূর্বেই ফলের প্রতি আমাদের আসক্তি জন্ম নেয়। নানা ভাবে সংশয়গ্রস্থ হয়ে পরমজ্ঞান লাভ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করি। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান বারবার নিষ্কাম কর্মের উল্লেখ করেছেন এবং কৃতকর্ম ভগবানের শ্রীচরণে অর্পণ করে কর্মবন্ধন হতে মুক্তিলাভেরর পথ দেখিয়েছেন ।

ভগবানের এই উপদেশের পরেও অর্জুন যে সংশয়মুক্ত হতে পারেননি তা পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতেই তিনি প্রকাশ করেছেন। অর্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন:

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ , পুনর্যোগং চ শংসসি।
য়চ্ছ্রেয় এতয়োরেকং , তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম ।।৫.১।।

"হে কৃষ্ণ, তুমি প্রথমে কর্ম ত্যাগ করার কথা বলেছ, পুনরায় কর্মযোগের অনুষ্ঠানের কথা বলছো। এই দুটোর মধ্যে

কোনটি অধিক শ্রেয় তা সুনিশ্চিতভাবে আমাকে বল ।"

সূক্ষ্মরূপে বিচার করলে দেখা যায় যে আমাদের হৃদয়ে যা যা প্রশ্ন উদয় হয় ভগবদগীতায় সেই সব প্রশ্নই অর্জুন করেছেন এবং ভগবান সরলভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আমাদের জীবনের এমন কোন প্রশ্ন নেই যার সদুত্তর গীতায় পাওয়া যায় না। গীতা সামান্য একটি পুস্তক নয়। গীতাকে বাঙ্ময়রুপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়। মানব জীবনের সামাজিক, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক সকলপ্রকার জ্ঞানের ভাণ্ডার এই ভগবদগীতা। তাই আমরা সবাই পরম জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ভগবদগীতার শরণাগত হয়েছি।

ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সবকিছু অর্পণ করে আজকের এই জ্ঞানময় সত্র এবং এই অধ্যায়ের আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে। তদ্‌পশ্চাৎ প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়।

<u>প্রশ্নোত্তর পর্ব</u>

প্রশ্নকর্তা : শ্রী গিরিধারী লাল দাদা
প্রশ্ন: এই অধ্যায়ের ১৮ নম্বর শ্লোকে ভগবান যে কর্ম ও অকর্মের কথা বলেছেন সেই বিষয়টি কি ?
উত্তর: ১৬ নম্বর শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে কর্ম ও অকর্মের ব্যবধান স্থির করতে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও বিভ্রান্ত হন। সেইজন্য অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবান স্বয়ং অর্জুনকে বলেছেন:

কর্মণ্যকর্ম য়য়ঃ(ফ্) পশ্যেদ্, অকর্মণি চ কর্ম য়ঃ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু , স য়ুক্তঃ(খ্) কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥১৮॥

"যিনি কর্মের মাঝে অকর্ম এবং অকর্মের মাঝে কর্মকে দেখেন, তিনিই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।"

প্রতিদিন আমরা দেখি যে সূর্যদেব পূর্বদিকে উদয় হন এবং পশ্চিমে অস্ত যান। বাস্তবে সূর্যদেব স্থির, অচল। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে, তাই সূর্যদেব গতিশীল বলে আমাদের ভ্রম হয়। সূর্যদেব স্থির, উনি কিছুই করেন না। উনার তেজ চতুর্দিকে নিজে নিজেই প্রতিফলিত হয়। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে এই কর্ম সূর্যদেব দ্বারা হচ্ছে।

প্রতিদিন সকালে অফিসে কর্মচারীরা এসে কাজ শুরু করার পূর্বে সহকর্মীদের সাথে গল্পগুজব করে। অফিসের ম্যানেজার অফিসে এসে যখন নিজের চেম্বারে গিয়ে বসেন, কর্মচারীরা নিজ নিজ আসনে এসে অফিসের কাজ শুরু করে। ম্যানেজার নিজে কোন কাজ করেন না, কিন্তু উনার উপস্থিতিতে অফিসের কাজকর্ম চলতে থাকে।

আমাদের স্বরূপ হল আত্মা, যার উপস্থিতিতে শরীর কাজ করে। হাত আদান-প্রদান করে, পায়ের সাহায্যে আমরা চলি, দেখার কাজ আমাদের চোখ করে, কান দিয়ে আমরা শুনি কিন্তু আমি হাত, পা, নাক, চোখ কিম্বা কান নই।

আদি গুরু শঙ্করাচার্য বলেছিলেন :

মনো বুদ্ধি অহংকার চিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্র জিব্‌হে ন চ ঘ্রাণ নেত্রে ।
ন চ ব্যোম ভূমি ন তেজো ন বায়ুঃ
চিদানন্দ রূপঃ শিবোऽহম শিবোऽহম ।।

"আমি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার কিম্বা স্মৃতি নই ; না আমি কান ,জিহ্বা, নাক অথবা চোখ । না আমি আকাশ, ভূমি, তেজ কিম্বা বায়ু; আমি চিদানন্দস্বরূপ আনন্দ, আমি শিব, আমিই শিব ।"

প্রশ্নকর্তা – বিপিন দাদা

প্রশ্ন : ৩৯ নম্বর শ্লোকের "অচিরেণাধিগচ্ছতি" শব্দটির অর্থ কি?

উত্তর: "অচিরেণাধিগচ্ছতি" শব্দটির অর্থ হল "অতিশীঘ্রই প্রাপ্ত হওয়া"।

প্রশ্নকর্তা :সুধাকর মিশ্র দাদা

প্রশ্ন: সদ্‌গুরু কিভাবে প্রাপ্ত হয়?

উত্তর: সদ্‌গুরু পাবার ইচ্ছা যখন তীব্র হয়, তখন গুরু স্বয়ং উপস্থিত হন। তবে স্বামী বিবেকানন্দের মত গুরুকে যাচাই করা অত্যন্ত আবশ্যক। আসক্তিযুক্ত ব্যক্তি কখনো সদ্‌গুরু হওয়ার উপযুক্ত নয়। এই অধ্যায়ে ভগবান আমাদের নিষ্কাম কর্মযোগের আচরণ ও তদ্‌পশ্চাৎ কর্মকে ভগবানের শ্রীচরণে অর্পণ করার উপদেশ দিয়েছেন এবং সেটাই মোক্ষপ্রাপ্তির সহজ পথ ।

প্রশ্নকর্তা – সতীশ পাণ্ডে দাদা

প্রশ্ন– যজ্ঞ করার সময় যে "ইদং ন মম" বলা হয়, তার অর্থ কি ?

উত্তর: "ইদং ন মম" অর্থ হল অর্পণ । কোন কার্য্য করার পর সেটি অর্পণ করে দিলে সেই কর্ম আর নিজের থাকে না এবং সেইভাবে মানুষ কর্মবন্ধন হতে মুক্তিলাভ করে।

প্রশ্নকর্তা – অনন্ত বিজয় দাদা

প্রশ্ন: ২৯ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, "অপান বায়ুতে প্রাণ বায়ুর আহুতি"। এর অর্থ কি?

উত্তর: পূরক ক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ যখন আমরা শ্বাস গ্রহণ করি , প্রাণ বায়ু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং অপান বায়ুর সাথে মিশে যায়। এই ক্রিয়াকেই বলা হয়েছে "অপান বায়ুতে প্রাণ বায়ুর আহুতি"। একই ভাবে অপান বায়ু যখন শরীর থেকে বেরিয়ে এসে বাতাসে মিশে যায়, সেই ক্রিয়াকে "প্রাণ বায়ুতে অপান বায়ুর আহুতি" বলা হয়।

প্রশ্নকর্তা: শ্রীনিবাস প্রসন্ন দাদা

প্রশ্ন: ধর্ম বলতে কি বোঝায়? ভ্রাতৃধর্ম কি ?

উত্তর: ধর্ম শব্দের অর্থ অতি বিশাল। "ধারয়তে ইতি ধর্মঃ।" – যা ধারণ করা হয়, সেটিই ধর্ম। শাস্ত্রের উপদেশ ধারণ করাকেই ধর্ম বলা হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্তব্যকে ধর্ম বলা হয়েছে। মায়ের কর্তব্যকে মাতৃধর্ম, পিতার ধর্মকে পিতৃধর্ম, সন্তানের ধর্মকে সন্তানধর্ম ইত্যাদি ।

রামায়ণে ভ্রাতৃধর্মের অনেক উদাহরণ উল্লিখত আছে। রামায়ণে বলা হয়েছে "শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ধর্মের বিগ্রহ"। জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভরত ও লক্ষ্মণের শ্রদ্ধা ও প্রেম, ছোটভাই ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের প্রতি জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রেম আমরা সবাই জানি।

লঙ্কাধিপতি রাবণের ভাই বিভীষণ ভ্রাতৃধর্ম পালন করেছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাবণকে অধর্মের পথ ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অহংকারী রাবণ বিভীষণকে কাপুরুষ বলে তিরস্কার করার পর তিনি লঙ্কা ত্যাগ করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শরণে এসেছিলেন।

এইভাবে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে এবং পরিশেষে সমাপনী প্রার্থনার পর জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগ অধ্যায়ের অর্থ বিবেচন সত্র সমাপ্ত হয়।

আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

https://vivechan.learngeeta.com/feedback/

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!
আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!
সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাত্মক লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!
আসুন আমরা সবাই গীতা পরিবারের এই ধ্যেয় মন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের গীতাশ্রেণী উপহার হিসাবে পাঠাই।

https://gift.learngeeta.com/

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

https://vivechan.learngeeta.com/

|| গীতা পড়ুন, পড়ান ,জীবনে গ্রহণ করুন ||
|| ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ||